গল্প

বটুক বড়ালের বিস্ফোরণ

মৈত্রেয়ী কুমার

খেয়াল করে দেখেছেন বটুকবাবু। যবে থেকে আদরের দুলাল মেয়ে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে বাইরে গেছে, অনামিকার এ সংসারে শুধু দেহখানাই পড়ে আছে। প্রথম প্রথম তো আলুথালু অবস্থা! ফ্যালফেলে চাউনি। থেকে থেকে ফোঁস ফোঁস, হা হুতাশ। দিন রাত বুক ভাঙা ‘হাঃ, হোঃ, ঈশ্বর!’ এইসব কাতরোক্তি। এদিকে মেয়ের বাইরে যাবার টাকার বন্দোবস্ত করতে গিয়ে বটুকবাবুর যে ল্যাজে গোবরে অবস্থা, সে খেয়াল রাখে কে?

ব্যাঙ্ক থেকে লোন নেওয়া ছাড়াও আপিসের কাছেও করুণা ভিক্ষা করতে হয়েছে। রিটায়ারমেন্টের আরো বছর বারো দেরী, এই ভরসায় কিছু সাহায্য পাওয়া গেছে। ফিনান্স ডিপার্টমেন্টের ফ্রম পিলার টু পোস্ট-এর গায়ে হাতে পায়ে তৈলমর্দন করতে করতে তাঁর নাভিশ্বাস ওঠার অবস্থা হয়েছিল। লোন স্যাংশান হয়েছিল ঠিকই, তবে ইদানীং তাঁর মনে হয় তাঁর ডেস্কেই যেন কাজের পাহাড়গুলো হাঁটু গেড়ে বসেই থাকে।

সংসারে কৃতজ্ঞতা বলেও তো একটা কথা আছে! এই যে এখন হাতওয়ালা একখানা গেঞ্জীও খুঁজে পাচ্ছেন না। যতবার আলমারীর তাক খাবলাচ্ছেন উঠে আসছে বগলকাটা গেঞ্জীগুলো যা আদিখ্যেতা করে অনামিকার বোন গতবার জামাইষষ্ঠীতে দু প্যাকেট উপহার দিল — সেই দুচক্ষের বিষগুলো। এদিকে আটটা চল্লিশের আপটা মিস্ করলে আজ লেট-এর চক্করে পড়তে তিনি বাধ্য। আপিসের নতুন ছোকরাগুলোর মতন তিনি তো আর হাজারীবাবুকে ওয়াট্স্ অ্যাপে মেসেজ পাঠাতে পারেন না, ‘অন দ্য ওয়ে, বস!’ বিশেষ করে হাজারীবাবু স্বয়ং যখন তাঁকে একদিন এই নিয়ে রসিকতা করে বলেছিলেন, ‘ছ্যামড়াগুলোর শয়তানি কি আর আমি বুঝি না? কমোডে বসে মেসেজ লেখে অন দ্য ওয়ে! আরে বাপু, সওয়া আটটায় তুই যদি অন দ্য ওয়ে তো আপিসে ঢুকতে তোর আরো সওয়া এক ঘণ্টা লেগে গেল?’

উপায় না দেখে বটুকবাবু বগলকাটার একখানাতেই তেতো মুখে মাথা গলালেন। এখনও খাবারের ডাক পড়ল না। গরম ধোঁয়া ওঠা ভাত গলা দিয়ে নামাতে পারেন না। কতবার অনামিকাকে বলেছেন ‘অন্ততঃ মিনিট পনেরো আগে বেড়ে দিও’ — তা কাকস্য পরিবেদনা। ব্যস্ত হাতে রুমাল, হাত ঘড়ি, মানিব্যাগ তিনটেকেই টার্গেট করতে গিয়ে বুঝলেন এক রাত্তিরেই মানিব্যাগটা প্রচুর ওয়েট লুজ করেছে। খুচরো পয়সার আজকাল যেন আকাল পড়েছে। অটোওয়ালা থেকে সবজিওয়ালা, মাছওয়ালা এমন কি পাড়ার মুচিটা পর্য্যন্ত ‘খুচরো আচে তো দাদা?’ বলে আগে এনকোয়ারি সেরে নেয়। আবার আপিস ফেরত প্রায়ই অনামিকার এটা ওটা বায়না লেগেই আছে। সে নতুন গুড়ের রসগোল্লা হোক কি এক গাছি কুমড়ো ফুল, বিষ্যুদবারের পূজার শালপাতার প্যাকেট হোক কি হরলিক্স বিস্কুট। আর এই সব জায়গায় দিতে হয় খুচরো। লক্ষ্য করে দেখেছেন, এরা কেউই কিন্তু কখনো রাউণ্ড ফিগারে দাম রাখবে না। হয় বলবে বারো, নয় বত্রিশ বা বাহান্ন!

‘এ হেঃ হেঃ,’ মানিব্যাগের পেটটা টিপে বললেন বটুকবাবু। ‘এক্কেরে লাইপোসাকশান সার্জারি সেরেছে!’ বিরক্ত মুখে গলা তুললেন, ‘বলি, খেতে টেতে দেবে কিছু?’

রান্নাঘরে উঁকি মারছে মোক্ষদার বড়ি খোঁপা। দুলে দুলে বাসন মেজে চলেছে সে এক মনে। অন্দরমহল থেকে ভাসা ভাসা উত্তর এল, ‘ও-মা, তুমি রেডী? মোক্ষদা-আ-আ-আ…!’

মনে মনে বিষম তেতে উঠলেও সামলালেন বটুকবাবু। মাস দুই হল ভোরের লাফিং ক্লাব জয়েন করেছেন। সেখানে শিখেছেন রাগ ব্যাটাচ্ছেলে যখন মাথার ঘিলুতে গুড়ি মেরে উঠতে চাইবে তখন হাসির হোস্ পাইপ নিয়ে অ্যাটাক করার জন্য সদা রেডী থাকতে হবে।

শব্দ করে চেয়ার টেনে বসতে বসতে বটুকবাবু ব্যাঁকা মুখে হাসলেন। ‘হেঃ হেঃ হেঃ, সময় তো আর আমার পোষা কুকুর নয় যে পায়ে পায়ে ঘুরবে! আমাকেই তার পেছনে গলায় বকলস্ বেঁধে কুত্তার মতন ছুটতে হয়।’

হাতের মোবাইলখানা আলগোছে ধরে বটুকগিন্নী আহ্লাদী গলায় বললেন, ‘বাঃ, বেড়ে বলেছ তো! সময় আমার পোষা কুকুর নয়! বাঃ! হুমম্… বিন্ বিন্ করছে, বিন্ বিন্ করছে… হ্যাঁ, সময়ের সারমেয়। দাঁড়াও, এক্ষুনি ক্যাপশানটা লিখে রাখি। পরে ভাবনাটা পদ্যে ছকে ফেললেই হবে।’

মোক্ষদা গোমড়ামুখে গরম ধোঁয়া ওঠা ভাতের থালা হতভম্ব বটুকবাবুর সামনে নামিয়ে রেখে চলে গেল। গিন্নী রসালো ঘন স্বরে বটুকবাবুর পাশে একটা চেয়ার টেনে বসতে বসতে বললেন, 'দু দিন ধরে নীলাম্বু সমানে আমার পিছনে লেগেছে জানো? বলে, আমি নাকি চলতে চলতে থেমে যাচ্ছি, বলতে বলতে ভুলে যাচ্ছি! এবার ওকে দ্যাখাবো আমার পদ্যসত্তা আবার ডানা মেলে উড়তে চাইছে, নাচতে চাইছে…'

'ধ্যাত্তোরি! দূর হ' — বলে বিষম জোরে চেঁচিয়ে তখন থেকে ভনভন করে উড়তে থাকা একটা বেয়াদপ মাছিকে তাড়ালেন বটুকবাবু। গিন্নীর পদ্য সত্তা গোঁত্তা খেয়ে চুপ।

ডালে লেবু ডলে এক গ্রাস মুখে তুলেছেন, গিন্নী গম্ভীর মুখে বললেন, 'শোনো! ঠিক করেছি আমার একটা কবিতা সংকলন বের করবো। নীলাম্বুর চেনাশোনা প্রকাশক আছেন। কোন অসুবিধে হবে না।'

কোঁত করে জল গিলে বটুকবাবু উঠে পড়লেন। হাত ধুতে ধুতে বললেন, 'তা কত খসাতে হবে এবার? মাসে মাসে মেয়ের পিছনে ডলারে টাকা যাচ্ছে আমার, বুঝলে, ডলারে! আমি আর এক পয়সাও বাজে খরচে যেতে পারব না।'

অনামিকার আহ্লাদী ভাবটা গেল ঘেঁটে। ঠিক তখুনি বটুকবাবু স্ত্রীর মুখের ভাবান্তরের থোড়াই কেয়ার দিয়ে বলে উঠলেন, 'আমার হাতওয়ালা গেঞ্জীগুলো গেল কোথায়, অ্যাঁ? একটাও খুঁজে পেলাম না!'

টেবিল ছেড়ে উঠে পড়লেন গিন্নী। কড়া গলায় বললেন, 'কি ছোটখাটো ব্যাপারে বকবক করছো! হাতকাটাগুলো আছে তো! মিলি কত ভালোবেসে দিল।'

'অ্যাঁ হ্ হ্! ভালোবাসা না ছাই! জামাইষষ্ঠীতে গেঞ্জী উপহার নিয়ে, যেতে হল ওহ্ ক্যালকাটা! বিশ হাজার টাকা খেটনের দাম গুনে দিতে হল কাকে? না এই জামাই বাবাজীকেই! গঙ্গাঁ জলে বেড়ে গঙ্গাঁপূজা, কেমন!'

অনামিকা কেবল দাঁত কিড়মিড় করলেন। টাকার কথায় জুতোর ফিতে বাঁধতে বাঁধতে বটুকবাবুর মনে পড়ে গেল মানিব্যাগের ওয়েট লসের কথা। গিন্নীকে ঠুসে বলে দিলেন, 'হাতওয়ালা গেঞ্জী না পাওয়াটা ছোটখাটো ব্যাপার নয়। তোমাকে যদি এখন বলি দিবারাত্র ওই নীলাম্বু জাম্বুবানটার সঙ্গে পদ্য নিয়ে পাকামি না করে মন দিয়ে ঘর সংসার কর, তা তোমার কেমন লাগবে শুনি?'

'কি?' ঘরে যেন বাজ পড়ল। 'আমার পদ্য চর্চাকে তুমি তোমার বিটকেল গন্ধওয়ালা ছাতাওয়ালা গেঞ্জীর সাথে তুলনা দিলে?' তর্জনী উঁচিয়ে ধেয়ে এলেন অনামিকা। 'তুমি আমার পদ্যসত্তার উন্নতিতে আজ পর্য্যন্ত কী করেছটা কী, শুনি? আর নীলাম্বু! যাকে তুমি জাম্বুবান বললে, সে আমার কলেজ জীবনের হারিয়ে পাওয়া বন্ধু। ভাগ্যে ছিল ফেসবুক! তারপর কফি হাউসে দেখা, ফোন নাম্বার দেয়া-নেয়া, আর তারপর? বাকিটা ইতিহাস!'

বটুকবাবু বিকট চেষ্টা করলেন হাসির হোসপাইপ খুলে পরিস্থিতি শীতল করার। বদলে ভসভস করে মুখ দিয়ে তীব্র স্বরে বের হল, 'আজ্ঞে না! বাকিটা আমার সব্বোনাশ।'

ছবি সৌজন্য: 'আবোল তাবোল'/নির্মল বুক এজেন্সি

ঝগড়ার ডেসিবেলের ধাক্কায় অন্য দিনের তুলনায় গড়গড়িয়ে হাঁটলেন বটুকবাবু। তাই আপিসে লেট হতে হল না। মনটাও কিছু শান্ত হয়ে এল। নকুড়কে গলা চড়িয়ে চা-এর হুকুম দিয়ে সহকর্মীদের সঙ্গে হালকা কিছু মস্করা, আগুন গরম বাজারদর, রোজকার ট্রান্সপোর্টের বেহাল হকিকত, খুচরো পয়সার আকাল, এইসব নিয়ে মাতব্বরী চালে দু একটা আলাপচারিতাও সেরে নিলেন। 'ঠক' করে টেবিলে চায়ের গ্লাস নামিয়ে নকুড় গম্ভীরমুখে এসে দাঁড়াল।

এই নকুড়ের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে আপিসে। যেহেতু সে বসের খাস বেয়ারা তাই তার আচার আচরণ, মুখভঙ্গী, গলার স্বরের তারতম্যে কার কপালে কখন কি নাচছে বোঝা যায়। নকুড়ের ভারিক্কী চালে মনে মনে প্রমাদ গুনলেন বটুকবাবু। 'কি ব্যাপার রে নকড়ে?' গলার স্বর যথাসম্ভব স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করলেন।

'ভেতরে যান। তলব পড়েচে,' নকুড়ের সংক্ষিপ্ত ভাষণ।

কোঁত কোঁত করে কোনক্রমে চা-টুকু গিলে বড়বাবুর চেম্বারের দিকে হাঁটা লাগালেন বটুকবাবু। এমনিতে বড়বাবু মানুষটা জাঁদরেল হলেও বস্ হিসেবে খারাপ নন। মেয়ে বাইরে যাবার সময় অতগুলো টাকা স্যাংশান তো করিয়ে দিয়েছেন। বটুক বড়াল আর যাই হোক, কৃতঘ্ন নয়। আজকাল আপিসে তিনি ষোল আনা ছাপিয়ে আঠারো আনাই নিজের ক্ষমতাটুকু দিতে চান। দু হাতে টেনে টেনে কাজ করেন।

সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে বটুকবাবু ঢুকে পড়লেন বড়বাবুর ঘরে। মুখে কোন পক্ষেই কথা হল না। হাতটা বুকের কাছে নিয়ে নমস্কারের ভঙ্গী করতেই বড়বাবু হাত নেড়ে বসতে ইশারা করলেন। খানিক পরে বটুকবাবু বুঝলেন স্যর তাঁকে খুব মনোযোগ দিয়ে পর্য্যবেক্ষণ করছেন। কি ব্যাপার? মনে মনে একটু অস্বস্তিবোধ হল ওঁর।

এবার ড্রয়ার থেকে স্যর বের করে আনলেন একটা সবুজ রঙা ফাইল। খুললেন। শেষের পাতাটা খুলে এগিয়ে দিলেন বটুকবাবুর সামনে। জাঁদরেল হলে কি হবে, গলাটা একেবারে মাখন মিহি বড়বাবুর। এখন গম্ভীর মুখে মিহি সুরে তিনি বললেন, 'সাপুড়জি-পালোনজি অ্যাণ্ড কোং-এর ফাইলটা আপনার কাছে ছিল না?'

তড়িঘড়ি বটুকবাবু বললেন, 'আজ্ঞে স্যর! আমি তো স্যর সব আপডেট দেখে দিইচি স্যর...'

হাত দেখিয়ে বটুকবাবুর কথার স্রোতে লগি ঠেলেন বড়বাবু। 'এইটে দেখুন তো। সাপুড়জিদের কোন বিষয়ের আপডেট লেকা আচে এতে?' বড়বাবু ফাইলটা ঠেলে দেন বটুকবাবুর কাছে।

শেষের পাতায় গুচ্ছের অডিটের লাভ ক্ষতির হিসেবের নীচে মোটা মোটা ছাঁদের অক্ষরে লেখা এ কি সব!

"বড় ভালো লাগে তোমার দেয়ালা,
তোমার টানে ছুটি টালিগঞ্জ টু বেহালা।
জীবনটা ছিল যেন বিষ তেতো করলা,
পাকা হাতে দিলে ঘাঁই হয়ে রাঙা কাতলা।
রগরগে ঝোলে ঝালে বেড়ে আছি কবিলা,
আমি পিরীচ, তুমি পেয়ালা।"

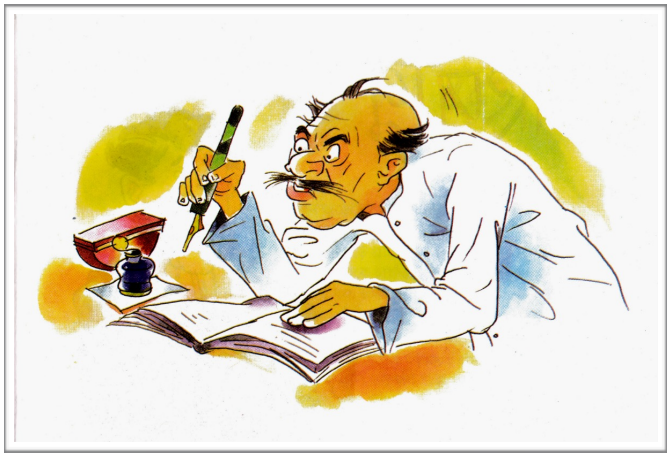

ছবি সৌজন্য: 'আবোল তাবোল'/নির্মল বুক এজেন্সি

হতভম্ব হয়ে মুখ তুললেন বটুকবাবু। বড়বাবু ওনার কালো কুচকুচে পেনটা মধ্যমা আর বৃদ্ধাঙ্গুঁষ্ঠের ফাঁকে ধরে নাচাচ্ছেন। ভাবটা আর বলে দেবার দরকার নেই। সেটা অবশ্যই এই যে, 'এ সবের মানে কি?' মানেটা যে কি হতে পারে সেটা ভাবতে ভাবতে বটুকবাবু হিমসিম খেতে লাগলেন।

এবার বড়বাবু মুখ খুললেন। বজ্রগম্ভীরমুখে এবং মিহিদানা সুরে বললেন, 'দেকুন বড়ালবাবু, এ জিনিষ যে আপনার নয় তাতে বিন্দুমাত্র আমার সন্দেহ নেই। আমি তো আর আপনাকে আজ দেকচি না। তিরিশ বছর হতে চলল। কতা হচ্ছে, এ কাজ করলে কে?' গলার স্বর খাদে নামিয়ে বটুকবাবু অপরাধী হয়ে বললেন, 'স্যর, আমি স্যর কেসটা দেখছি স্যর। আর যাতে কোনদিন সে সাহস না পায় তার ব্যবস্থা আমি দেখছি।'

'সাহস? কার সাহস?' বড়বাবু দমবার পাত্র নন। অগত্যা বটুকবাবু হাটে হাঁড়ি ভেঙে বললেন, 'স্যর, হস্তাক্ষরগুলো এখেনে কিছুটা খেলানো বটে, কিন্তু আমার পকেটে যে কাগের ঠ্যাঙ বগের ঠ্যাঙ করে আলু-পিঁয়াজ-চারাপোনা-ছটা ডিমের বাজার ফর্দ গোঁজা আছে তাতে অত ছিরিছাঁদ না থাকলেও, অক্ষরের মিল দেকে মালুম হচ্ছে এ কাজ আমার মিসেসের স্যর।'

'মিসেসের? হুমম,' বলে গুম মেরে যান বড়বাবু। গতিক সুবিধের নয় দেখে বটুকবাবু বোঝান — 'আসলে স্যর, একমাত্র মেয়েটা বাইরে পড়তে চলে যাওয়ার পরে গিন্নী খুব মুষড়ে পড়েছিলেন। চিরটা কাল বস্‌গিরি করার স্বভাব তো! স্যরি স্যর, ভুল বুঝবেন না, হম্বি তম্বি করে খবরদারি ফলাবার আর কেউ রইল না, আমি স্যর আর কতক্ষণ থাকি, হেঃ হেঃ... তো যা বলছিলুম। দিবারাত্র শুধু ফোঁস ফাঁস, হুঃ হাঃ। খাওয়া দাওয়া, নিদ্রা ঘুম কিছু নাই। তা আপিসের ওই বিপিনবাবুর পরামর্শে গেলাম নিয়ে একদিন মনোময় মাইতির কাছে। খুব নামকরা মনোবিদ স্যর। সহজে কি আর অ্যাপো...' কালো পেন নেড়ে বড়বাবু বললেন, 'কাম টু দ্য পয়েন্ট, মিস্টার বড়াল।'

আগের কথা গিলে বটুকবাবু বললেন, 'স্যরি স্যর।' তারপর ধুতির পকেট থেকে রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে যাবেন একটা গোলাপী রঙের চার ভাঁজ করা রশিদ বেরিয়ে এল। ভাঁজ খুলে দেখে কেমন যেন একটা বাঁকা হাসি খেলে গেল বটুকবাবুর মুখে। তিনি চিরকুটটা বড়বাবুর সামনে মেলে ধরে বললেন, 'অ্যাই যে, অ্যাই, দেকুন স্যর, একবারটি দেকুন।'

বড়বাবু পেন নাচানো বন্ধ করে চিরকুটে চোখ মেলে বললেন, 'এ তো বিল দেকছি।'

'আজ্ঞে।' বটুকবাবু কপালের ঘাম মুছে বললেন, 'পেছনটা উল্টে দেকুন, ওই ধোপাবাড়ির, থুড়ি, ড্রাইক্লিনীং-এর বিল।'

বড়বাবু বিলের পশ্চাদ্দেশ ঘুরিয়ে দেখেন সবুজ কালিতে গোটা গোটা ছাঁদে লেখা —

"মনের যত ময়লা যদি পেট্রোলওয়াশ হতো,
মাস পোহালে পয়লা আমি ধুতেম অবিরত।
যেদিকে চাই আজ যে দেখি ময়লা মনের ভ্যাট,
কাজের বেলায় ফক্কাকড়ি, কথা ক্যাঁট ক্যাঁট।"

'বাঃ!' বড়বাবুর মুখ বেশ হাসি হাসি হয়ে উঠল। 'আজ্ঞে?' বলে বটুকবাবু বড়বাবুর মন পড়তে চাইলেন। ততক্ষণে বড়বাবু বটুকবাবুকে বললেন, 'এমন লেখা ধোপাবাড়ির বিলে কেন?'

বটুকবাবু টাক চুলকাতে লাগলেন। বড়বাবুর এনকোয়ারীর সুরটা ঠিক ভালো লাগল না তাঁর। কি বলবেন বুঝতে না পেরে বুকের কাছে দুহাত জড়ো করে ফের বললেন, 'আজ্ঞে!'

বড়বাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'জীবনটা অডিটের খেরো খাতা করে ফেলেচেন দেকচি। গুনীর গুণ কদর করতে শিকুন। এখন আসুন।'

বটুকবাবু মনমরা হয়ে যেই পিছু ফিরেছেন, বড়বাবু ফের হেঁকে বললেন, 'মনোবিদ মাইতি আপনার মিসেসকে দেকে কি বললে, সেটা বললেন না তো!' বটুকবাবু আমতা আমতা করে বললেন, 'আজ্ঞে স্যর, তিনি বলেছেন গিন্নীকে সর্বদা খুশী রাখতে এবং তিনি যা করতে চান, তাতে বাধা না দিতে।'

'ওঃ, স্প্লেণ্ডিড! আপনি মিসেসের দেকভাল বেশ ভালই করচেন দেকচি। গুনী কবি কাব্যচর্চা করছেন ধোপাবাড়ির বিলে। বাঃ বাঃ। শুনুন,' মিহি গলা গম্ভীর করে বলেন বড়বাবু — 'পার্ক স্ট্রীটের অক্সফোর্ডে চলে যান। ওখেনে সবচেয়ে দামী ফুলেল ডিজাইনে বাঁধানো খাতা কিনে স্ত্রীর হাতে দিন। বিষয়খোর জমিদার পর্য্যন্ত রামপ্রসাদের কবিগুণ বুঝেছিলেন বটুকবাবু। আর আপনি সামান্য অডিটবাবু হয়ে এত রসকষহীন হলেন কেমনে? অ্যাঁ?'

বটুকবাবু অপমানে মাথা নীচু করলেন। বড়বাবু হাত নেড়ে বললেন, 'যান! আর হ্যাঁ, মিসেসকে বলবেন, আজ থেকে আমি ওনার আর এক গুণমুগ্ধ পাঠক। কোথায় কবে ওনার পদ্যসভা থাকে তা আমি আপনার থেকে জেনে নেবো'খন। দেকবেন, ওনার কলম যেন না থামে।'

বড়বাবুর ঘর থেকে আগুন মাথা হয়ে বেরলেন বটুকচন্দ্র। ‘এঁঃহ, বড় এলেন কাব্য সমঝদার! আমার থেকে পদ্যসভার খোঁজ করা হবে। কেন? আমি কি গিন্নীর সেক্রেটারি না কি রে?’

বড়বাবুর মুণ্ডুপাত করতে করতে থেবড়ে বসলেন চেয়ারে। নকুড়কে ডাকতে হল না। জবাই হওয়া জীবের থোবড়া চিনতে তার অসুবিধে হয় না। সে বিনা বাক্যব্যয়ে এক গেলাস জল টেবিলে দিয়ে গেল। জল গিলতে গিলতে বটুকবাবু মনের তপ্ত কড়াইতে নানা ভাবনাচিন্তার ফুটকড়াই ভাজতে থাকলেন। ‘কাব্যের বেগ না ইয়ের বেগ! একেবারে আপিসের ফাইলে?’

এতদিন বাজার ফর্দ, দোকান বিল, মায় ইলেকট্রিসিটির বিলে লাইন, দুলাইন সহ্য করেছেন। অস্থির হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ‘নাঃ। আজ এসপার কি ওসপার।’

হাত মুঠো করে শূন্যে ছুঁড়লেন, দাঁত বের করে হাসলেন। আবার বসলেন। মনের আগুনে কথা সেঁকা চলতেই থাকল তাঁর। ‘তিরিশ বছরের কর্মক্ষেত্র বলে কতা। আজ ওই ছাঁইপাশ কতগুলো প্রলাপের জন্য মান সম্মান সব গেল? বলি, আপিস ফাইলটা কি তোমার বগল কামাতে যাওয়া বিউটি সেলুনের বিল? আজ চাকরি থেকে নক্ আউট হলে মেয়ের ভবিষ্যৎখানা দেখবে কে? ওই জাম্বুবান নীলাম্বু? এঁঃহ, আবার ফুলেল খাতা দিতে হবে ওনাকে।’ আবার দেঁতো হেসে শেষে টেবিলে খান দুই মৃদু ঘুঁষি মেরেছেন কি মারেন নি, পাশের টেবিল থেকে কৃষ্ণ বটব্যাল উঠে এলেন, ‘ব্যাপার কি হে তোমার?’ বলে।

বৃত্তান্ত শুনে খানিক ভাবলেন কৃষ্ণ বটব্যাল। বিপিনবাবুর কল্যাণে বটুক গিন্নীর এই পদ্য বেগের ইনটলেরান্স সিণ্ড্রোমের কথা আপিসের কম বেশী সবাই জানে। প্রকৃত সুহৃদজ্ঞানে বটুকবাবুকে কৃষ্ণবাবু বললেন, ‘বাপু হে, রাগকে চিত্ত জয় করতে দিও না। তোমার লাফিং থেরাপি দেকচি কিস্যু করতে পারেনি। মনে রেখো তোমার মাথায় এখন বকাসুরের মত দেদার লোনের বোঝা। বড়বাবুকে চটিতং করে কোনো লাভ আছে কি? ওনার বলা শেষ বাক্যটি ভুলো না — “দেকবেন, ওনার লেখা যেন না থামে।” অর্থাৎ বৌদির পদ্য সাপ্লাই বন্ধ মানে বড়বাবুর কৃপাদৃষ্টি তোমার উপর অন্ধ। কি আর করবে? যার যাতে মজে মন/ কি বা হাঁড়ি, কি বা ডোম। ফুলেল খাতাটি কিনেই নিও, ভাই।’ এই বলে উঠে গেলেন কৃষ্ণবাবু।

গিন্নীর পদ্যকে একেবারে হাঁড়ি-ডোমের সাথে তুলনা দেওয়ায় মনে মনে একটু খারাপ লাগলেও প্রতিবাদ করার শক্তি পেলেন না বটুকবাবু। সেদিন কাজেও আর মন বসাতে পারলেন না। নিদৃষ্ট সময়ের কিছু আগেই বাড়িমুখো রওনা দিলেন। দরকার নেই, দরকার নেই করে পাড়ার লালাবাবুর দোকান থেকে একখানা বাঁধানো খাতাও কিনে ফেললেন।

ঘরে ঢুকে দেখেন এ কী চেহারা হয়েছে গিন্নীর আধ বেলায়? উস্কোখুস্কো চুল, দরদরে ঘেমো মুখ, ব্যথা আর ক্লান্তিতে ভরা। লতপতে শাড়ির আঁচলে কাটা থোড়ের মতন পড়ে আছে বিশাল মোটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা একটা হাত। আর অন্য হাতটা মুঠোয় ধরে করুণ চড় খাওয়া মুখে বসে নীলাম্বু!

হতভম্ব বটুকবাবুকে দেখে নীলাম্বু উঠে দাঁড়াল। ‘ইয়ে মানে…’ তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে গিন্নীর দিকে এগিয়ে গেলেন বটুকবাবু। ‘এ কি ব্যাপার? কি হয়েছে?’ জিজ্ঞাসা করাতে গিন্নী দাপুটে সুরে বললেন, ‘হবে আবার কি? চোকের মাথা খেয়েচো না কি? দেকতে পাচ্চো না, হাত ভেঙে গেচে?’

‘ক্কি কি করে?’ বটুকবাবুর ব্যবহারে অবাকই হলেন অনামিকা। তাঁকে নিয়ে স্বামীর এ জাতীয় ব্যস্ততা আজকাল তো ডুমুরের ফুল। নীলাম্বু এগিয়ে এসে বললে, ‘স্যর, মানে হয়েছে কি, আজ দুপুরের মুরগীহাটা সাহিত্যবাসরে অনামিকা একটা বিশ্রী তর্কে জড়িয়ে পড়ে। এক উঠতি কবি দাবী করে যে মেয়ে কবিদের প্যানপ্যানানি অসহ্য। ছন্দ মিল নেই, তাল নেই, দুর্ধর্ষ শব্দবন্ধ নেই। কেবল নাকি ভেসভেসে আবেগের বেনো জল। মেয়েদের পদ্য বিষয় নির্বাচনও অর্বাচীনের ন্যায়। সেই সংসারের খাওয়া লাথি ঝাঁটা, সেই প্রকৃতির নানা রকম রং ঢং দেখে হা হা, হু হু। সেই বস্তাপচা নারীবাদ! তো সেই মিচকেপটাশটা বলেছে মহিলা কবিগুলোর হাতে তো এমনিই জোর নেই, ভাবনায় জোশ্ আসবে কি করে! মারকাটারিং কাব্য লিখতে গেলে না কি স্যর ডাম্বেল ভাঁজা বাহুবল চাই! আমরা সবাই মনে মনে বিরক্ত হচ্ছিলাম। অনামিকা, স্যর, মাঝখান থেকে ব্যাটাকে হাতকুস্তিতে লড়াই করে নারী বাহুবলীর নেওতা দিয়ে বসলো।’

কাঁচুমাচু মুখে নীলাম্বু থামলে বটুকবাবু ব্যস্ত হয়ে শুধোলেন, ‘তারপর?’

কর্তার উৎসাহ দেখে গিন্নী এবার পিলে চমকানো গলায় কেঁদে উঠলেন, ‘ওগো, ওই মুশকো পালোয়ানটা এক মোচড়ে আমার হাতটাই চুমড়ে দিল গো! কি ধুমসো একটা তুমি ভাবতে পারবে না গো! ওটা একটা কবি? কবির হাত অমন ভীমের গদামার্কা হয় না কি গো…!’

স্ত্রীর আচমকা কান্নার তোড়ে বটুকবাবুর বাক্যস্ফুর্তি হল না। পাশে ফোঁচ ফোঁচ শুনে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেন মাইয়্যা লোকের অধম নীলাম্বুটা চোখে রুমাল চাপা দিয়েছে। হঠাৎ করে তাঁর খেয়াল হল, গিন্নী পদ্যকুস্তিতে তার ডান হাতটা ভেঙে এসেছেন। নিজের কপালে সপাসপ চড় মারতে মারতে উঠে দাঁড়ালেন বটুকবাবু। ‘ও হো… হো… হো…।’

স্বামীর আচরণে ঘাবড়ে গেলেন অনামিকা। নীলাম্বুও রুমালে নাক ছেঁচে স্তম্ভিত। বটুকবাবু এবার বগলচাপা বাঁধানো খাতাটা টেবিলে নামিয়ে দেওয়ালে মাথা ঠুকতে ঠুকতে হাউ হাউ করতে লাগলেন — ‘হে ভগবান, এমন মাথামোটা কবিও হয়? ওরে, ভাঙবি যদি বাম হাতটা ভাঙলি না কেন? এখন আমার শ্যামও গেল, কুলও গেল।’

গিন্নী আকুল। বললেন, ‘ওগো, তোমার হল কি?’

বটুকবাবু ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন, ‘হবে আর কি?

বারো হাত কাঁকুরের তেরো হাত বিচি,
বড়বাবু চটে গেলে আমি ভেগে গেচি।
গিন্নীর পদ্য পড়তে না পেলে,
গোঁসাঘরে খিল দিয়ে কিল মোরে দেবে।
কিল খেয়ে কিলহজম সোজা কথা নয়,
চাক্ষুষ দেখি আমি সব নয়ছয়।’

‘দুম’ করে একটা ভারী আওয়াজে হুঁশ ফিরল বটুকবাবুর। দেখেন সোফায় পড়ে গিন্নী গোঁ গোঁ করছেন আর নীলাম্বু হাওয়াই চটিতে পা গলিয়ে স্রেফ হাওয়া।

বেড়ে আছেন এখন বটুকবাবু। লালাবাবুর জাবেদা খাতা নিজেই ভরাচ্ছেন। আশ্চর্য্য, এত ভাব ভাবনারা সব ছিল কোথায়? যেন মনের ম্যানহোলের ঢাকনা খুলে গেছে। তবে ঠিক করেছেন গিন্নী সুস্থ হলে খাতা-কলম ‘যার কাজ যারে সাজে’ বলে গিন্নীর হাতেই তুলে দেবেন।

— সমাপ্ত —

আমার লেখা ই-মেলে পাওয়ার জন্য বং ঢং ডট কম-এ সাইন আপ করুন